বি জিনিয়াস
উইথ
মুহাম্মাদ ﷺ

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ

ভাষান্তর : ফরহাদ খান নাঈম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

জন্মের নিদর্শনসমূহ	১৩
নবিজির দাওয়াতি প্রতিভা	২৩
নবিজির সামরিক প্রতিভা	৩৪
নবিজির রাজনৈতিক প্রতিভা	৬৭
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নবিজির প্রতিভা	৭৬
বার্তাবাহক হিসেবে নবিজি	৮৩
বন্ধু হিসেবে নবিজি	৯৫
রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নবিজি	১০৬
জীবনসঙ্গী হিসেবে নবিজি	১০৯
বাবা হিসেবে নবিজি	১২৭
মনিব হিসেবে নবিজি	১৩৩
আল্লাহর বান্দা হিসেবে নবিজি	১৩৮
মানুষ হিসেবে নবিজি	১৪৪
ইতিহাসের পাতায় নবিজি	১৫৪

জন্মের নিদর্শনসমূহ

তখন পৃথিবী ছিল ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। গোটা বিশ্ব তার ধর্মবিশ্বাস খুইয়ে হারাতে বসেছিল যাবতীয় শৃঙ্খলা। বিলুপ্ত হতে যাচ্ছিল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তিবিধানের সব ধরনের উপায়। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা মূলত সৃষ্টি হয় একটি অদৃশ্য শক্তি দ্বারা, যেখানে দুর্বলদের জন্য সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি মনোসামাজিক সম্পর্ককে ধাবিত করতে হয় ইতিবাচক দিকে। আর বাহ্যিক শান্তি-শৃঙ্খলা নির্ভর করে রাষ্ট্রের আপসহীন আইনের ওপর; যা দ্বারা নিপীড়ক ও নিপীড়িতের মধ্যকার সকল বিবাদ মীমাংসিত হয়, জুলুম থেকে মুক্তি পায় মজলুম, সর্বোপরি নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয় চারপাশ।

বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি রোম তার মত-বিশ্বাস থেকে সরে এসে এক অর্থহীন বিতর্কিত সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ে; যেটি মূলত পূর্বকথিত সেই অন্ধকার যুগেরই জানান দিচ্ছিল। এর ফলে নিজের দিগ্‌বিজয়ী শক্তি হারাতে বসেছিল রোম। এতদিন পর্যন্ত যারা রোমের আশ্রিত ছিল, সেই তারাই রোমকে করায়ত্ত করার জন্য হয়ে উঠল বেপরোয়া। আর পারস্য ছিল তখন নিজ ক্ষমতা দ্বারা মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট—যেন নিজেদের ধর্মকে নিজেরাই উপহাস করছিল প্রতি পদক্ষেপে। ফলে অচিরেই হুমকির মুখে পড়ল তাদের রাজত্ব। পারস্যের রাজদরবার তখন ছেয়ে গিয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতা, বিশৃঙ্খলা এবং অবৈধ যৌন লালসার মতো নানাবিধ অপকর্মে। আবিসিনিয়ার অবস্থা ছিল আরও করুণ। নিজেদের ধর্মীয় স্বকীয়তা জলাঞ্জলি দিয়ে তারা মগ্ন হয়ে পড়ে মূর্তিপূজার সংস্কৃতিতে। একত্ববাদের সাথে মূর্তিপূজাকে মিলিয়ে ফেলে। নিজেদের ধর্মের মধ্যে এই বিকৃতি সাধনের ফলে তারা সত্বরই জীবনের লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়ে। ফলে তারা কোনোরূপ স্থায়ী অর্জন কিংবা সফলতার দেখা পায়নি। এমনই এক ভগ্নপ্রায় পরিস্থিতিতে একটি আপাদমস্তক পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত ব্যবস্থা খুঁজছিল সমগ্র বিশ্ব।

একটি জাতি

এই ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর মধ্যে একটি জাতি ছিল। যে জাতিটি তখনও কোনো রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি; বরং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল মাত্র। এই জাতির নাম আরব জাতি। আরবরা সবে নিজেদের অস্তিত্ব ও এর গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছিল তখন। পাশাপাশি তারা আঁচ করতে পারছিল চতুষ্পার্শ্বে থাকা সমূহ বিপদ। বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন এই জাতি তার ভ্রান্তি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছিল প্রতিনিয়ত।

পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর অভিমুখে ভ্রমণ করার সময় বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোকে প্রায়ই বিশাল মরুভূমি অতিক্রম করতে হতো। এই বিস্তীর্ণ মরুর পুরোটাই ছিল স্বাধীনচেতা আরবজাতির দখলে। আরবরা ছিল তৎকালীন ম্রিয়মাণ বিশ্ব পরাশক্তির শাসন থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। তবে রোম ও পারস্যের ক্ষমতা যখন তুঙ্গে, তখন আরবরাও তাদের আয়ত্তাধীন হওয়ার ভয়ে ছিল তটস্থ। তবে অচিরেই তারা আবিষ্কার করল— পারস্য ও রোমান সভ্যতাও অনেকাংশেই তাদের ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃত অর্থেই বাণিজ্যিকভাবে তারা ছিল কার্যত আরবদের নিয়ন্ত্রণাধীন। আরবরা যদি নিজ ভূখণ্ডে তাদের ব্যাবসা করার অনুমতি না দিত, তাহলে বাণিজ্যিকভাবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। তা ছাড়া ইয়েমেন ও শাম দেশে[১] ব্যবসায়িক সফরের সময়েও এই দুই পরাশক্তির বণিকদের আরব উপত্যকার মধ্য দিয়ে যেতে হতো, যার চারপাশ ছিল মরুচারী আরব বেদুইন দ্বারা বেষ্টিত।

কিন্তু এই ভারসাম্যপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। একপর্যায়ে মক্কার শাসনভার গ্রহণ করার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস।

আবার নিজ দেশে আরেকটি তীর্থস্থান নির্মাণের মানসে ইয়েমেনের গভর্নর আবরাহা অভিযান পরিচালনা করে কাবাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে; এমনকী অরক্ষিত আরব উপত্যকার দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্ত দিয়ে শুরু হয় পারসিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশ। এমন বিরূপ প্রতিবেশের মধ্যে হঠাৎ করেই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদ অনুভব করল আরব জাতি। তারা লক্ষ করল—তাদের বিশাল মরুদেশ ইতোমধ্যেই কঠিন হুমকির মুখোমুখি এবং প্রতিবেশী দেশগুলোই তাদের সমূহ বিপদের কারণ। শত্রুর উপস্থিতিতে তাদের জাতিসত্তাই ধ্বংস হতে চলেছে প্রায়। তারা বুঝতে পারল—এ উপত্যকা বাঁচাতে হলে নিজস্ব ভূখণ্ডের যাবতীয় ঘাটতি ও দুর্বলতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো বিকল্প নেই।

এই মরুময় উপত্যকার মধ্যেই ছিল এক শহর। গোটা আরবের সম্পদসমূহ একীভূত হতো সেখানে। আর এই পুরো সম্পদের মালিকানা ভোগ করত শহরের সব থেকে ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বংশ। তখনকার সমাজব্যবস্থায় একদিকে যেমন বিলাসিতা, অবাধ যৌনাচার, মদ্যপান, জুয়া আর সম্ভোগের মচ্ছপ চলছিল, ঠিক অন্যদিকে ছিল দরিদ্রতার কষাঘাত, দুঃখ, যাতনা আর সীমাহীন দাসত্ব। এহেন শোচনীয় পরিস্থিতিতে আরবের বুকে প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী আদর্শ। কিন্তু যখনই সমাজের বিজ্ঞজনরা ধর্ম ও আদর্শের কথা বলতেন, তখনই পূর্বপুরুষদের অনুসৃত মিথ্যাচারের দোহাই দিয়ে সেসব প্রত্যাখ্যান করত একটি দল।

একবার নাখলায় একদল লোক গুরুত্বপূর্ণ মূর্তি ওজ্জাকে[২] কেন্দ্র করে পূজার আয়োজন করে। তাদের মধ্য একজন হঠাৎ বলে উঠল—

---

[১]. বর্তমানে সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন, লেবানন ও তুরস্কের কিছু অংশ ছিল তখনকার শাম দেশ।

[২]. মক্কার সবচেয়ে বড়ো মূর্তি

> ‘আল্লাহর শপথ! আমাদের কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই। আমরা যা করছি, তা নিতান্ত মিথ্যাচার। একটি পাথরের মূর্তি যেটি কিছু দেখতে বা শুনতে পায় না, কারও উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে না, সেটিকে ঘিরে তাওয়াফ করে কী লাভ! সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই নিশ্চল প্রস্তরের মাথায় প্রথানুযায়ী রক্ত ঢালার কোনো অর্থ নেই। অতএব, হে লোকসকল! চলো আমরা অন্য কোনো ধর্ম খুঁজি।’

এই আহ্বানের পর একদল মূর্তিপূজা ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হলো। কিছু লোক গ্রহণ করল সন্ন্যাসব্রত। আরেকটি দল অপেক্ষা করতে লাগল নতুন কিছুর আশায়। অবশেষে যখন ইসলাম আবির্ভূত হলো, তারা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করল ইসলামের ছায়াতলে। ইসলাম আসার পূর্বেই যারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। এই ওয়ারাকাই পরবর্তী সময়ে তাওরাত থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে নবিজির নবুয়তের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছিলেন। আর যারা প্রচলিত মিথ্যা ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে একটি নতুন ধর্ম ও আদর্শ খুঁজছিল, তারা সবাই ওয়ারাকার এই কথা বিশ্বাস করে নিলো।

অন্য একটি দল বিবেক দ্বারা তাড়িত হয়ে সুবিচারের খোঁজ করছিল সর্বত্র। হাশেম, জোহরা ও তাইম গোত্রের বংশধরগণ আল্লাহর নামে একটি চুক্তি সম্পাদন করল এই মর্মে—‘যেখানেই জুলুম সংঘটিত হোক না কেন, তারা অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়াবে।’ এই চুক্তিই ইতিহাসে হিলফুল ফুজুল নামে পরিচিত। নবিজি যৌবনে এই চুক্তিটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বলেছিলেন— ‘আমি ইবনে গাদানের বাড়িতে সবকিছুর তুলনায় এই চুক্তিকেই অধিক ভালোবাসতাম।’

সব মিলিয়ে আরব তখন নিজেকে একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। চতুষ্পার্শ্বে শত্রুর আনাগোনা আর মাথার ওপর ধ্বংসের ঘণ্টাধ্বনি বাজতে থাকলেও পুরোপুরি ধসে পড়েনি এই জাতি। কারণ, চূড়ান্ত পতনের পূর্বেই তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এভাবে ধীরে ধীরে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও সংস্কারের দিকে ধাবিত হচ্ছিল সমগ্র আরব জগৎ।

একটি গোত্র

আরবের ওই শহরে ছিল একটি সম্ভ্রান্ত গোত্র। এই গোত্রের আবার দুটি শাখা ছিল। একটি শাখা নিয়ন্ত্রিত হতো ক্ষমতাসম্পন্ন লোকজনদের দ্বারা। নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা যেকোনো কিছুই করতে পারত। কামনা-বাসনা মেটানোর ক্ষেত্রে তারা ছিল ঐতিহ্যগতভাবেই প্রচণ্ড লোভী। অন্যদিকে আরেকটি দলে ছিল ধর্মভীরু লোকজন। স্বভাবের দিক থেকে তারা ছিল অত্যন্ত সহিষ্ণু। তারা প্রায়শই সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে মুক্ত করে উভয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করে দিত।

নবিজির দাওয়াতি প্রতিভা

তখন জাহেলিয়াত থেকে মুক্তিলাভের জন্য নবিজির অপেক্ষায় ছিল গোটা বিশ্ব। আর আল্লাহ তায়ালা এই মহান মিশনের দায়িত্ব পালনের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-কে মনোনীত করলেন। কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতি ও নবিজির মনোনয়ন দুটো মিলে গেলেও, বিশ্বময় এই দাওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যম ছাড়া এই মিশনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর থেকে যেত। নবিজির এই দাওয়াতি মিশনের মধ্যে সকল বিস্ময়ের বিস্ময় ও অলৌকিক সকল নিদর্শনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। আর তাই নবুয়তের মতো এই বিরাট, জটিল ও বৈচিত্র্যময় মিশনে অত্যন্ত সফল ভূমিকা পালন করেছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর মানবীয় গুণাবলির উৎকর্ষতা দেখে লোকেরা সহজেই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করত।

কথাবার্তা ও ভাষাগত দিক থেকে তিনি ছিলেন অসম্ভব রকমের বাগ্মী। মানুষের হৃদয় জয় করে নেওয়ার এক আশ্চর্য গুণ ছিল তাঁর। প্রত্যেকেই খুব সহজেই তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করত। মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বানে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। তাঁর ঈমানদীপ্ত আহ্বান লোকেরা ফিরিয়ে দিতে পারত না। এই গুণাবলির কারণে তিনি অন্য সবার থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। পারিপার্শ্বিক সকল পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলেও একজন দাঈর মধ্যে উপর্যুক্ত গুণাবলি না থাকলে, তিনি কখনোই তার দাওয়াতি কাজে সফল হতে পারবেন না।

বাগ্মিতা

বাগ্মিতার সম্পর্ক বক্তব্যের সঙ্গে। শব্দের উচ্চারণভঙ্গি ও বক্তব্যের বিষয়বস্তু দুটোই বাগ্মিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কখনো কখনো দেখা যায়—বক্তব্যের বিষয়বস্তু খুব চমৎকার; কিন্তু বাচনভঙ্গির দুর্বলতার দরুন তা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে না। আবার কখনো এমন হয়, বাচনভঙ্গি অত্যন্ত মধুর; কিন্তু বিষয়বস্তুর দৈন্যের কারণে তা হৃদয়গ্রাহী হয় না।

নবিজি যা বলতেন, যেভাবে বলতেন, তার পুরোটাই ছিল বাগ্মিতায় পরিপূর্ণ। তাঁর সময়কার আরবীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী ছিলেন তিনি। নিজেই বলতেন—‘আমি কুরাইশ বংশের, দুধ পান করেছি সাদ ইবনে বকর গোত্রে।’ উল্লেখ্য, তৎকালীন আরবে সাদ ইবনে বকর গোত্রের আরবি ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ। উক্ত গোত্রে দুধপান ও লালিত-পালিত হওয়ার ফলে তিনি সহজেই বিশুদ্ধ আরবিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়—ভাষার শব্দচয়ন ঠিক থাকলেও উচ্চারণ বিশুদ্ধ থাকে না। আবার অনেক সময় উচ্চারণে শুদ্ধতা থাকলেও বাগ্মিতা নষ্ট হয়ে যায় অগোছালো শব্দচয়ন ও আনাড়ি

উপস্থাপনার ফলে। কিন্তু নবিজির কথাবার্তায় একদিকে যেমন ছিল বিশুদ্ধ উচ্চারণ, তেমনি ছিল তাঁর চমৎকার শব্দের গাঁথুনি। এ ব্যাপারে স্বয়ং তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.)-ই বলছেন—‘তোমরা যেভাবে কথা বলো, নবিজি সেভাবে বলতেন না। তাঁর কথা এতটাই স্পষ্টভাবে শোনা যেত—যেকোনো শ্রোতা তা সহজেই মনে রাখতে পারত। তাঁর শব্দচয়ন ছিল নির্ভুল, বাচনভঙ্গি আকর্ষণীয় আর উচ্চারণ ছিল মাধুর্যপূর্ণ। অত্যন্ত গোছালো, পরিশীলিত ও যুক্তিনির্ভর কথা বলতেন তিনি।’

কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করে ও সাদ ইবনে বকর গোত্রে দুধপান করে যেকোনো ব্যক্তিই হয়তো বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও শব্দ প্রয়োগে কথা বলতে পারত; কিন্তু নবিজির মতো এত মর্মস্পর্শী আলোচনা আর কেউ করতে পারত না। তাঁর কথায় বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি একটি অভ্যন্তরীণ আকর্ষণ ছিল, যা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত শ্রোতাদের। তিনি কম কথা বলতেন; তবে প্রতিটি কথা ছিল গভীরভাবে অর্থবহ। এককথায়, তিনি যা বলতেন ও যেভাবে বলতেন, তা ছিল ঐশ্বরিক সৌন্দর্যে ভরপুর।

তাঁর সৌন্দর্য ও আত্মবিশ্বাস

বাগ্মিতার সাথে সাথে কায়িক সৌন্দর্য ও উন্নত রুচিবোধের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল নবিজির মধ্যে, যা তাঁকে সহজেই মানুষের কাছে নিয়ে যেত। বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সবাই তাঁর এই চমৎকার ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য দিত। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ নবিজির এই বৈশিষ্ট্যের ধারে-কাছেও যেতে পারেনি; পারবেও না কোনোদিন।

ধনী-গরিব সবার কাছ থেকে তিনি ভালোবাসা পেতেন। এক্ষেত্রে নবিজির একজন ছোট্ট সাহাবি জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-এর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) অনেক ছোটো বয়স থেকেই নবিজির তত্ত্বাবধানে ছিলেন। অনেক বছর পর যখন তাঁর বাবা এলেন তাঁকে ফিরিয়ে নিতে; কিন্তু জায়েদ (রা.) রাজি হলেন না। দীর্ঘদিন পর বাবাকে দেখার পরও তিনি ফিরে গেলেন না; থেকে গেলেন নবিজির সোহবতে।

নবিজির প্রতি মানুষের ভালোবাসা আর সুধারণার আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে খাদিজা (রা.)-এর দাসী মাইসারা থেকে। নবিজি একবার খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে সিরিয়ায় ব্যাবসা করতে যান। তাঁর সাথে ছিল খাদিজা (রা.)-এর দাসী মাইসারা। ফিরে আসার পর খাদিজা (রা.) তাঁর কাছ থেকে নবিজির ব্যাপারে জানতে চাইল। তখন সে খাদিজা (রা.)-এর সামনে নবিজির ব্যবসায়িক কৌশল ও সততা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে। অথচ চাইলেই সে সমস্ত সফলতার কৃতিত্ব নিজে নিতে পারত। কিন্তু তা না করে সে নবিজির ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা (রা.)-এর কাছে সত্যটা প্রকাশ করে দেয়।

নবিজির রাজনৈতিক প্রতিভা

প্রতিদ্বন্দ্বী ও অনুসারীদের সঙ্গে নবিজির কর্মপন্থা

আধুনিক সাহিত্যে রাজনীতির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এটি একদিকে যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচারবিধি বজায় রাখাকে বোঝায়, আবার একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি ও সাচিবিক ব্যবস্থাপনাকেও নির্দেশ করে। কোনো দেশের শাসক এবং সে দেশের নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্কও এর বাইরে নয়; এমনকী একটি দেশের মধ্যকার সকল গণতান্ত্রিক দল ও নিজ নিজ মন্ত্রিপরিষদও রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও পরিভাষা রয়েছে। তবে রাজনীতি বলতে এককথায় সবগুলোকেই বোঝায়।

নবিজি রাজনীতির বিভিন্ন অঙ্গনে যুক্ত ছিলেন। তবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে সফল রাজনৈতিক পদক্ষেপটি ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধি। এ সন্ধি তাঁর সামরিক নেতৃত্বের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে। এই সন্ধি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও অনুসারীদের সাথে নবিজির কর্মপন্থার সুকৌশল সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। যখন যুদ্ধ ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্য পথ থাকত, তখন তিনি সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে শান্তির পথে এগোতেন। যখন বলপ্রয়োগ ব্যতীত কোনো পন্থাই আর থাকত না, কেবল তখনই আক্রমণের পথ বেছে নিতেন। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হুদাইবিয়ার সন্ধি।

হুদাইবিয়ার সূচনা হয় মূলত হজের আহ্বানের মাধ্যমে। সেবার নবিজি মুসলমান ও পার্শ্ববর্তী সকল আরব গোত্রকে মক্কায় পবিত্র হজ পালনের জন্য আহ্বান করেন। উল্লেখ্য, তখন মুসলমান ছাড়াও অন্যরা কাবা শরিফ তাওয়াফ করত। তাই মুসলিম ও পার্শ্ববর্তী সমগ্র আরব গোত্র যখন একসঙ্গে হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করল, তখন স্পষ্টতই দুটি বিভাজন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মুসলমান ও সমগ্র আরব থাকে একপাশে, আর কুরাইশরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে। ফলে কুরাইশরা মুসলমানসহ গোটা আরবের এত বিরাট দলের বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের কোনো যুদ্ধবিগ্রহের সিদ্ধান্ত নিতে সাহস পায়নি। এটি মূলত নবিজির রাজনৈতিক কৌশলেরই একটি অনন্য নিদর্শন। পবিত্র হজকে সামনে রেখে তিনি মুসলমানের সাথে গোটা আরবকে একত্রিত করে দিয়েছিলেন—যাতে কুরাইশদের বিপক্ষে মুসলমানদের বিজয় কেউ ঠেকাতে না পারে।

ইতঃপূর্বে কুরাইশরা আরবকে বিভাজন করার অভিযোগ তুলেছিল মুসলমানদের বিপক্ষে। তারা অভিযোগ করেছিল, মুসলমানরা আরবের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার মাধ্যমে পারস্পরিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্কের অবনতি ঘটাচ্ছে। কিন্তু নবিজি যখন সেই হজযাত্রায় মুসলিম-অমুসলিম সমগ্র আরবকে একত্রিত করলেন, তখন কুরাইশদের সকল অভিযোগ মুহূর্তে ধসে পড়ল।

এ রকম পরোক্ষ অবরোধের বিভিন্ন ঘটনা আমরা বর্তমান সময়েও দেখতে পাই। এ রকম পরোক্ষ অবরোধের মাধ্যমে বিপক্ষ দলের সঠিক ও ন্যায্য পথ বেছে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি—ভারতের রাজনীতিবিদ গান্ধী ও তার অনুসারীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই পথ অবলম্বন করেছেন। কখনো কখনো এই কৌশলটি বড়ো বড়ো বোমা ও সমরাস্ত্র ব্যবহারের চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। কথিত আছে, গান্ধী পরোক্ষ অবরোধের মাধ্যমে শত্রুপক্ষকে ধরাশায়ী করার এই কৌশলটি শিখেছিলেন বিখ্যাত রুশ সংস্কারক লিও টলস্টয়ের কাছ থেকে। আবার অনেকে বলে থাকেন—গান্ধী এটি হিন্দু ও অন্যান্য বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে রপ্ত করেছেন।

অনেকে মনে করে—মুসলমানরা পরোক্ষ অবরোধের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাদের ধারণা—ইসলাম মুসলমানদের শুধু জিহাদ করতেই শিখিয়েছে; অথচ নবিজি এই হুদাইবিয়ার ঘটনায় উভয়পক্ষের মধ্যকার জটিলতা কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়া যতটা সুন্দরভাবে সমাধান করেছিলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। চাইলেই তিনি সঙ্গে থাকা বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে কুরাইশদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন; কিন্তু তা করেননি। কারণ, তিনি দেখেছিলেন— এখানে যুদ্ধ ছাড়াও শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিন্ন পথ রয়েছে। যখন যে পরিস্থিতিতে যেটি প্রয়োজন, সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করতেন তিনি। কখনোই একরোখাভাবে যেকোনো একদিকে লেগে থাকেননি।

তা ছাড়া তিনি মক্কায় যাচ্ছিলেন মূলত হজ পালনের উদ্দেশ্যে; কোনো ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। যারাই তাঁকে এই সফরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিল, প্রত্যেককেই তিনি একই উত্তর দিয়েছেন। এটা যে নিছক হজ সফর, তার সর্বাপেক্ষা প্রমাণ হলো—তাঁদের সাথে কোনোরূপ ভারী যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। প্রত্যেকের কাছে মাত্র একটি করে তরবারি ছিল। আর নিজের কাছে তরবারি রাখা ছিল তখনকার আরব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার মাধ্যমে নবিজি গোটা আরব থেকে কুরাইশকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। শুধু আরব থেকেই নয়; বরং আবিসিনিয়া থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল কুরাইশরা। তারা যখন দেখল নবিজিকে সমর্থন করছে গোটা আরব, তখন তাদের সামনে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ থাকল না। তা ছাড়া নবিজি সাহাবিদের ধৈর্য ও শান্তি বজায় রাখতে বলেছিলেন, যাতে কুরাইশরা যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার কোনো অজুহাত খুঁজে না পায়। তবে শুধু অল্প কয়েকজন সাহাবিই তৎক্ষণাৎ নবিজির এই কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন।

বন্ধু হিসেবে নবিজি

দয়া-বাৎসল্য

একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং সহজাত প্রযত্নের অনুভূতি মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা সৃষ্টি হয়। আর এই বন্ধুত্ব কতটা গভীর হবে; তা নির্ভর করে পরস্পরের প্রতি আবেগ, রুচি, মূল্যবোধ, আনুগত্য ইত্যাদির ওপর। কারণ, কখনো কখনো এমন হয়—একজন মানুষ আরেকজনকে ভালোবাসা সত্ত্বেও নিছক রুচিবোধের অভাবে সম্পর্ক পূর্ণতা পায় না। আবার ভালোবাসাকে পূর্ণতা দান করার জন্য শুধু সুরুচিবোধই যথেষ্ট নয়। উভয়ের মধ্যে কোনো নৈতিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকলেও অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় ভালোবাসা। সম্পর্ক তখনই সম্পূর্ণ ও দৃঢ় হয়, যখন উভয়ের মধ্যে প্রাণবন্ত আবেগ, সুরুচিবোধ ও শক্তিশালী নৈতিকতা বিরাজমান থাকে। আর এসব কিছুর বিবেচনায়, মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর পরিচিত সকলের সঙ্গে ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, উষ্ণ এবং সামাজিক। বয়স, জাত কিংবা সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য ভুলে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন তিনি।

কীভাবে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, সে বিষয়টি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন একেবারে কৈশোর বয়স থেকে। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি তাঁর চাচার সাথে এক ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়ায় যান। চাচার সাথে তাঁর সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিল যে, এত কম বয়সেও ভাতিজাকে রেখে যেতে পারেননি তিনি।

নবিজির বয়স যখন ৬০, কোনো এক ভ্রমণযাত্রায় তিনি একবার তাঁর মায়ের কবরের নিকট উপনীত হন। বহুদিন পর মায়ের কবর দেখে শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মতো কোমল ও মহৎ অন্তঃকরণের ব্যক্তি আর দ্বিতীয়টি আসেনি, আসবেও না কোনোদিন।

তাঁর বয়স তখন ৪০। সঙ্গীদের সঙ্গে বসে আছেন। এমন সময় হঠাৎ করেই দেখতে পেলেন, দুধমা হালিমা এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। তাঁকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার মা, আমার মা বলে নিজের চাদর বিছিয়ে দেন তাঁর জন্য। ৪০ বছর বয়সেও তিনি নিজের দুধমাকে ভোলেননি; এমনকী যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, নবিজি তাঁর জন্য উট, ভেড়া ইত্যাদি পাঠাতেও ভুলতেন না।

হুনাইনের যুদ্ধের পর হাওয়াজিন নামে পরাজিতদের একটি গোত্র নবিজির নিকট এলো। তাঁর (দুধ-মায়ের দিক থেকে) এক চাচাও ছিল তাদের সাথে। চাচার সম্মানে তিনি মুসলমানদের হাওয়াজিন গোত্র থেকে প্রাপ্ত সমস্ত গনিমত, নারী ও শিশু ফিরিয়ে দিতে সুপারিশ করেন।

মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা স্বেচ্ছায় এগুলো ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন না, সেগুলোর পরিবর্তে মূল্য পরিশোধ করে তা ফিরিয়ে দেন তিনি।

উম্মে আয়মান নাম্নী এক অনারব দাসী শৈশবে নবিজিকে লালন-পালন করেছিলেন। বড়ো হওয়ার পরও তাঁর প্রতি দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন যথেষ্ট দায়িত্বশীল। এজন্যই উম্মে আয়মান (রা.)-এর সাথে উত্তম কাউকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার ব্যাপারে উদ্‌বিগ্ন ছিলেন সব সময়; যেমন বাবা তার মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে উদ্‌বিগ্ন থাকেন। তিনি সাহাবিদের বলেছিলেন—কেউ যদি কোনো জান্নাতি নারীকে বিবাহ করতে চায়, সে যেন উম্মে আয়মান (রা.)-কে বিবাহ করে। যখনই দেখা হতো, মা বলে সম্বোধন করতেন তাঁকে। কোনো এক যুদ্ধে উম্মে আয়মান (রা.) তাঁর নিজের ভাষায় দুআ করছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে এটিও নবিজির দৃষ্টি এড়ায়নি, তাঁর প্রতি হৃদ্যতা প্রদর্শন করেন তিনি।

তিনি যে শুধু তাঁর পরিচিতজনদের সাথেই হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন, তা-ই নয়; বরং তাঁর এই কোমলতা, দয়াপরবশতা পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রহার করেননি; এমনকী ধমক পর্যন্ত দেননি কখনো। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন—‘আমি ১০ বছর নবিজির খেদমত করেছি। এই ১০ বছরের মধ্যে তিনি একটিবারের জন্য আমার প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ করেননি। কখনো তিনি বলেননি—‘তুমি এটা কেন করলে অথবা এটা কেন করলে না? তিনি ছিলেন সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল একজন ব্যক্তি। তাঁর হৃদয়ে কালিমার লেশমাত্র ছিল না। যদি তিনি কোনো কিছু ভালোবাসতেন, তাঁর চেহারা দেখে বোঝা যেত সেটি। আর যদি তিনি কোনো কিছু অপছন্দ করলেও তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত তাঁর চেহারায়।

তিনি শুধু তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সাথেই দয়াপূর্ণ আচরণ করতেন না; বরং তাঁর এই মমতা ও ভালোবাসা মানুষকে ছাড়িয়ে স্পর্শ করত সৃষ্টির প্রতিটি অংশে। বিড়ালের দুধ পান করতে যেন সুবিধা হয়, এ কারণে দুধের পাত্রটা পর্যন্ত নিচু করে ধরতেন তিনি। তাঁর এক দাসের ছোটো ভাই একটি পাখি নিয়ে খেলা করত। সে পাখিটা মরে যাওয়ায় ছেলেটি অত্যন্ত মর্মাহত হয়। প্রিয়নবি এই ক্ষুদ্র বিষয়টিতেও তাঁকে সমবেদনা জানাতে ভোলেননি। তিনি মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছেন—‘যখন তোমরা কোনো পশুর ওপর সওয়ার করবে, ওদের যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম দেবে। কখনোই অমানুষের মতো আচরণ করবে না ওদের সাথে।’ তিনি আরও বলেছেন—‘এ সমস্ত বোবা প্রাণীদের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো! যখন সেগুলোর ওপর তোমরা আরোহণ করবে, তখন দয়ার সাথে আরোহণ করো। তাদের খেতে হলে উত্তমরূপে খাও।’

রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নবিজি

মানুষকে তিনভাবে শাসন করা যায়। প্রথমত, দুনিয়াবি ক্ষমতা দিয়ে। দ্বিতীয়ত, আখিরাতের ক্ষমতা দিয়ে। আর তৃতীয়ত, নিজের মাহাত্ম্য ও যোগ্যতা দিয়ে। এই তিন দিক থেকেই নবিজি সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পার্থিব ক্ষমতা দিয়ে তিনি তাঁর অধীনস্থ সকলকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত জীবনব্যবস্থায় অভ্যস্ত করেছিলেন। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নবি ও রাসূল আখিরাত সম্পর্কে যা কিছু জানতেন, সে সবকিছুর জ্ঞানই দান করা হয়েছিল তাঁকে। এর ফলে তিনি সহজেই লোকদের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগত মানবীয় গুণাবলি ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা দ্বারা জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন সকলের মনে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন মানুষের বন্ধু হয়ে, তাদের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি নিয়ে।

রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাহাবিদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যেকোনো কিছুর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন নেতার প্রতি অনুসারীদের ভালোবাসাকে। তিনি বলেছেন—‘কেউ যদি কোনো ইমামকে অপছন্দ করে, তবে সে ইমামের নামাজ কবুল হবে না।’ অনুসারীদের যা করতে বলতেন, তিনি নিজেও তা করতেন। হাদিসে এসেছে— কোনো এক সফরে খাবারের সময় উপস্থিত হলে সাহাবিদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল—‘আমি ভেড়া জবাই করব।’ আরেকজন বলল—‘আমি এটির চামড়া ছাড়াব।’ অপর একজন বলল—‘তাহলে এটি রান্নার ভার আমি নিলাম।’ সাথে সাথে নবিজি বলে উঠলেন—‘আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করব।’ তাঁরা বললেন—‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার হয়ে কাজটি করে দেবো।’

তিনি বললেন—‘আমি জানি তোমরা করবে, কিন্তু আমি এখানে তোমাদের একেজন হয়েই থাকতে চাই। আমি বিশেষভাবে বিবেচিত হতে পছন্দ করি না।’

খন্দকের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে মদিনাকে হেফাজতের জন্য যখন এর চারপাশে পরিখা খনন করা হচ্ছিল, সাহাবিদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এই কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। সাহাবিরা তাঁকে বিরত থাকতে বললেও তিনি স্বেচ্ছায় তাঁদের সাথে হাত লাগিয়েছেন; অথচ চাইলেই তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারতেন। আর তাঁর সাহাবিরাও কিছুই মনে করতেন না। কিন্তু তিনি তো বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, সর্বোত্তম আদর্শ। সাহাবিদের কাজে নামিয়ে দিয়ে কী করে বসে থাকতে পারেন তিনি!

মানুষের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিচারকার্যে কখনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না। সকল বিচারে সামনে রাখতেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে। এ কারণে নিজ আত্মীয়ের বিচার করতে গিয়েও তাঁর হাত কাঁপেনি। অপরাধীর ন্যায্য শাস্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

একবার তিনি বাসার বাইরে দুজন লোককে কথা কাটাকাটি করতে দেখলেন। তারা মূলত এসেছিল নবিজির কাছে বিচার চাইতে। তিনি তাঁর হুজরা থেকে বের হলেন। বললেন—‘আমি একজন মানুষ। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ খোলামেলাভাবে বিষয়টি আমার সামনে উপস্থাপন করো। আমি সকল কথা শ্রবণ করেই বিচারের রায় দেবো। তবে অজ্ঞতাবশত আমার বিচারে যদি কোনো মুসলমানের অধিকার খর্ব হয়, তাহলে জেনে রেখ— আমি তাকে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার দিলাম। এখন সে এটি রাখবে, না ফেলে দেবে—সেটা একান্তই তার ব্যাপার।’

বর্তমানে অনেকেই চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলে। তারা মনে করে, চিন্তার স্বাধীনতার বিষয়টি পৃথিবীতে মশহুর হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে—ফরাসি বিপ্লবের বহু পূর্বেই আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর পূর্বে নবিজি চিন্তার স্বাধীনতার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—‘মানুষ যা ভাবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাবনা অনুযায়ী কোনো কাজ করবে।’

ইউরোপীয় সাহিত্যিকরা দাবি করে—আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে শাস্তির ওপরে দয়াকে প্রাধান্য দেওয়া আধুনিক যুগের একটি আবিষ্কার। কিন্তু তারা ভুলে যায়, আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে নবিজি নিজেই এর সবথেকে বড়ো দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছেন—‘যখন আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সৃষ্টি করলেন, তখন এই মর্মে ওয়াদা করলেন যে, আমার রাগের চেয়ে দয়া বেশি এবং তিনি দয়াপরবশতাকে ভালোবাসেন। কেউ দয়া দেখালে তাকে তিনি পুরস্কৃত করেন; যে পুরস্কার কোনো নির্দয় ব্যক্তি কখনোই পায় না।’ তিনি আরও বলেন—‘আল্লাহ তায়ালা আমাকে কঠোর ও কর্কশ চরিত্র দিয়ে পাঠাননি; বরং পাঠিয়েছেন একজন শিক্ষক হিসেবে।’ সাহাবিগণ বর্ণনা করেছেন—যখন তাঁর সামনে দুটি বিষয় রাখা হতো, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তিনি তুলনামূলক সহজ বিষয়টি গ্রহণ করতেন।

জীবনসঙ্গী হিসেবে নবিজি

সংসারে স্বামীর ভূমিকা অনুধাবন করার জন্য সর্বাগ্রে আলোচনা করতে হয় পুরুষ ও নারীর মর্যাদা নিয়ে। ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে আরব ও আরবের বাইরে নারীদের যে শোচনীয় অবস্থা বিরাজমান ছিল, তার সাথে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীর অবস্থান তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

ইসলামের পূর্বে ও পরে নারীর অবস্থার পার্থক্য বিবেচনা করতে গেলে দুটি মৌলিক বিষয় আমাদের সামনে উঠে আসে। প্রথমত, ইসলামের পূর্বে নারীকে দেখা হতো নিছকই ভোগ্যপণ্য আকারে। পণ্যের মতোই বেচাকেনা হতো তারা। কিন্তু ইসলাম এসে নারীকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে, নিশ্চিত করেছে উত্তরাধিকার। বিবাহের পরও নারী তার নিজস্ব সম্পদের মালিকানা ভোগ করতে পারবে, নারীকে সেই স্বাধীনতাও দিয়েছে ইসলাম।

ইসলামের পূর্বে কন্যা সন্তানকে অপমানের কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পিতা-মাতারা কন্যা সন্তানকে মনে করতেন সংসারের বোঝা। ফলে তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করে দিত। কিন্তু ইসলাম নারীকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে সমূহ বিপদাপদ ক্ষয়ক্ষতি থেকে।

আরবের বাইরেও নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্গিন। রোমান সাম্রাজ্যে নারীদের সাথে দাসীর মতো আচরণ করা হতো। শুরুর দিকে খ্রিষ্টান ধর্মেও নারীদের মনে করা হতো অপবিত্র। সামরিক বিপ্লবের যুগে নারীদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। জন ল্যাংডন ডেভিস (১৮৯৭-১৯৭২) তার বই *এ শর্ট হিস্টোরি অব উইমেন*-এ উল্লেখ করেছেন—

> ‘সামরিক বিপ্লবের যুগে পুরুষরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল। এ যুগে নারীদের সাথে পুরুষদের শারীরিক কোনো সংশ্লিষ্টতাই ছিল না; বরং তারা নারীর পরিবর্তে ঘোড়ার প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করত। ফলে ওই যুগকে নারীদের যুগ না বলে বরং ঘোড়ার যুগ বলাটা অধিক যুক্তিযুক্ত। একপর্যায়ে নারীর পরিবর্তে ঘোড়ার সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়াতে বংশবৃদ্ধির বিষয়টি হুমকির মুখে পড়ে যায়।’

এ বিষয়ে *Song of Deeds* বইয়ের একটি গল্প উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘অসিস নামক এক ব্যক্তির কন্যা একদিন জানালার পাশে বসেছিল। গারান তাকে দেখে বলে উঠে—‘দেখ গার্বার্ট! মেরির শপথ! তার মতো সুন্দরী আমি এর আগে আর কাউকে দেখিনি। আর কী অপূর্ব তার চোখ দুটো!’ উত্তরে গার্বার্ট বলে—‘ঠিকই বলেছ। তার মতো এত সুন্দর কোনো ঘোড়াও নেই।’

যদিও এটি খুব ছোটো একটি গল্প, তবে এর দ্বারা নারীদের প্রতি তৎকালীন পুরুষদের তীব্র অবজ্ঞা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

সে সময় একজন পুরুষ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে একজন নারীকে বিয়ে করে আবার ছেড়েও দিতে পারত। এক্ষেত্রে নারীদের মতামতের গুরুত্ব ছিল শূন্য। সামরিক বিপ্লবের যুগ পার হয়ে যখন পশ্চিমা সভ্যতার যুগ এলো— নারীরা তখনও ছিল সমাজের চোখে তুচ্ছ। ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগের নারীদের চেয়েও অধিক শোচনীয় ছিল তাদের অবস্থা। মাত্র এক শিলিংয়ের বিনিময়ে নারী বেচাকেনা হতো। ১৮৮২ সালের আগ পর্যন্ত উত্তরাধিকারের সম্পত্তিতে নারীদের কোনো অংশ ছিল না এবং এ নিয়ে তারা কোথাও অভিযোগও করতে পারত না।

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার কয়েকজন ব্যক্তি মিলে মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার জন্য একটি মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করে; অথচ সেই মেডিকেলকে অবৈধ ঘোষণা করে তৎকালীন মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। সেখান থেকে পাস করা মহিলা ডাক্তারদের কোথাও চাকরি হতো না; এমনকী উক্ত মেডিকেলে কোনো রোগী ভর্তি হলে সেই রোগী পরবর্তী সময়ে অন্য কোথাও চিকিৎসাও গ্রহণ করতে পারত না। আধুনিক যুগে পশ্চিমারা যদিও নারী স্বাধীনতার কথা বলে মুখে ফেনা তোলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার নামে তারা নারীকে ভোগ্য পণ্যে পরিণত করেছে। বিষয়টি এত শোচনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা জাহেলি যুগের নারীদের অবস্থাকেও হার মানিয়েছে।

মুহাম্মাদ ﷺ এসে নারীদের এই শোচনীয় অবস্থা আপাদমস্তক পরিবর্তন করে দেন। পবিত্র কুরআনের শুধু একটি আদেশ থেকেই এ কথা বোঝা যায়—

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ-

> ‘আর নারীদের ওপর তাদের স্বামীদের যেরূপ স্বত্ব আছে, স্ত্রীদেরও তাদের পুরুষদের (স্বামীর) ওপর তদনুরূপ ন্যায়সংগত অধিকার আছে।’ সূরা বাকারা : ২২৮

কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ভালো না-ও বাসে, তবুও ইসলাম তাকে তার স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ করতে আদেশ দিয়েছে। কুরআনে এসেছে—

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا-

> ‘আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে; তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন—তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।’ সূরা নিসা : ১৯

এ ছাড়া পুরুষদের মতো নারীদের জন্যও উত্তরাধিকার নির্ধারিত করেছে ইসলাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ-

> ‘পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।’ সূরা নিসা : ৩২

ইসলাম নারীদের ওপর পুরুষদের কখনোই প্রাধান্য দেয়নি; বরং নারীদের ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্ব তুলে দিয়েছে পুরুষদের ওপর। তা ছাড়া নবিজি বলেছেন—‘মুসলমানদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।’ নবিজি পুরুষদের নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করতে বলেছেন। তাদের ভুলগুলোকে শুধরে দিতে বলেছেন হিকমতের সাথে। বলেছেন—‘তোমরা নারীদের সাথে সদয় আচরণ করো। মনে রাখবে, নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে। আর পাঁজরে যত হাড় রয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে সবার ওপরের হাড়টি। যদি তোমরা এটি সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙে যাবে। আর যদি সেভাবেই রেখে দাও, তাহলে তা বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে সদয় আচরণ করো।’

তিনি পুরুষদের আদেশ দিয়েছেন, তারা যেন সৌন্দর্যমণ্ডিত করে নিজেদেরকে স্ত্রীদের সামনে উপস্থাপন করে। বলেছেন—‘তোমরা তোমাদের কাপড় পরিষ্কার রাখবে, শরীরের অপ্রয়োজনীয় পশম ছেঁটে ফেলবে, নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করবে, নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। কারণ, বনি ইসরাইলের পুরুষরা এসব কাজ না করার দরুন তাদের স্ত্রীরা ব্যভিচারে লিপ্ত হতো।’ তিনি আরও বলেছেন—‘তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোনো নারীকে বিবাহ করতে যায়, আর সে যদি কালো রং দ্বারা তার পাকা চুল ঢেকে রাখে, তাহলে তাকে অবশ্যই উক্ত নারীকে বিষয়টি জানাতে হবে।’

কীভাবে একজন নারী তার স্বামীর সাথে সুখে সংসার করতে পারে, এ বিষয়টিও তিনি গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। তিনি পুরুষদের আদেশ দিয়ে বলেছেন—‘তোমরা যখন কোনো লম্বা সফর থেকে আসো, তখন তোমরা সরাসরি বাসায় প্রবেশ করো না; বরং আগে থেকে তোমাদের আগমনের ব্যাপারটি স্ত্রীদের জানিয়ে দাও, যাতে তারা তাদের নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে এবং তাদের চুল বেঁধে পরিপাটি হতে সময় পায়।’

স্ত্রীদের সাথে নবিজির আচরণ

নবিজি তাঁর সাহাবিদেরকে স্ত্রীদের প্রতি যতটা কোমল হতে উপদেশ দিতেন, নিজ স্ত্রীদের সাথে তার চাইতেও অধিক কোমল ছিলেন তিনি। স্ত্রীদের সাথে কথা বলতেন সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে। সকাল-সন্ধ্যা দেখতে যেতেন তাঁদের। আয়িশা (রা.) বলেন—‘স্ত্রীদের সাথে একান্তে সময় কাটানোর সময় তিনি অত্যন্ত কোমলভাবে ও হাসিমুখে তাঁদের সাথে কথা বলতেন।’

নবুয়তের দায়িত্ব তাঁকে তাঁর স্ত্রীদের থেকে কখনো আলাদা করতে পারেনি। স্ত্রীদের সাথে তিনি এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন যে, কখনো কখনো তাঁরা ভুলেই যেত, তাঁরা কথা বলছেন আল্লাহর

রাসূলের সাথে! নবিজির সাথে কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত। একবার উমর (রা.) নবিজির গৃহে গিয়ে নবিপত্নী হাফসা (রা.)-এর উচ্চবাচ্চ্য শুনতে পেলেন। নবিজির সাথে তাঁর কন্যার এরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন তিনি। একপর্যায়ে তিনি হাফসা (রা.)-কে থাপ্পর দিতে উদ্যত হন, কিন্তু নবিজি তাঁকে প্রশমিত করে বলেন—'হে উমর! এ কাজের জন্য তুমি আদিষ্ট হওনি।' তিনি স্ত্রীদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে গৃহস্থালির কাজকর্মে অংশ নিতেন। তিনি বলেছেন, স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করা পুরুষদের জন্য সাদাকাস্বরূপ।

নবিজি তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সমানভাবে আচরণ করতেন। সকলের সাথে একরকম আন্তরিকতা প্রদর্শন করতেন। কখনো কমবেশি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা চাইতেন আল্লাহর কাছে। দুআ করতেন—'হে আল্লাহ! আমি তো সর্বদাই তাদের সাথে সমান আচরণ করতে চাই, কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সুতরাং আপনি আমাকে সেসবের জন্য ধরাশায়ী করবেন না, যাতে আমার কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই।' এমনকী তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনও তাঁর সকল স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো আয়িশা (রা.)-এর সাথে কাটান। চাইলে কারও অনুমতি না নিয়েই তিনি এ কাজ করতে পারতেন এবং অন্য স্ত্রীরাও এর জন্য তাঁকে দায়ী করতেন না; কিন্তু তবুও সমতা বিধানের জন্য সকলের অনুমতি চেয়েছেন তিনি।

সাধারণভাবে কারও সাথে ভালো আচরণ করা নিঃসন্দেহে একটি মানবীয় গুণ; কিন্তু যখন স্ত্রীর বিশ্বস্ততা ও চরিত্রের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠে, তখনও স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ বজায় রাখা কঠিন কাজ। এক্ষেত্রেও নবিজি তাঁর স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ বজায় রেখেছেন। আয়িশা (রা.)-এর ইফকের ঘটনা থেকে ব্যাপারটি খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়।

বহুবিবাহ

আমরা এখানে নবিজির বহুবিবাহ সম্পর্কে কথা বলব। সন্ত্রাসবাদের পর বহুবিবাহ হচ্ছে ইসলামের শত্রুদের দ্বিতীয় টার্গেট। বহুবিবাহের কারণে তারা নবিজির চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে; এমনকী একে কেন্দ্র করে নবিজিকে চরিত্রহীন বলতেও দ্বিধাবোধ করে না।

প্রথমে তারা নবিজিকে যুদ্ধবাজ বলে গালি দেয়, এরপরই অপবাদ দেয় নারীপ্রিয় বলে। এ দুটির মাধ্যমে তারা মূলত নবিজিকে বদমেজাজি ও কামুক বলে আখ্যা দিতে চায়। অথচ এই দুটির কোনোটিই তাঁর মধ্যে ছিল না এবং সন্ত্রাসবাদের চেয়ে তাঁর নারীপ্রিয়তার অভিযোগের আরও দুর্বল। যেকোনো নিরপেক্ষ বিশ্লেষকের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট যে, নবিজির বহুবিবাহের মধ্য দিয়ে তাঁর কামুকতা প্রকাশ পায় না।

আল্লাহর বান্দা হিসেবে নবিজি

চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য

ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হলেও চারটি বৈশিষ্ট্য প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। এই গুণগুলো সাধারণত সমানভাবে একজন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। যদি কোনো মানুষের মধ্যে এই চারটি গুণ সমানভাবে বিদ্যমান থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই আদর্শের দিক থেকে অন্য সবার চেয়ে ওপরে অবস্থান করেন তিনি। এই গুণগুলো হলো—

আল্লাহর ইবাদত করা : আল্লাহর ইবাদত করার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রতিটি জীব এক পরিবারভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছুই আল্লাহর ইবাদতে রত।

সব সময় চিন্তামগ্ন থাকা : মানুষ যখন তার চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে ভাবতে থাকে, তখন তার কাছে এই পুরো বিশ্বটাকে একটি গবেষণাগার বলে মনে হয়।

সুন্দর প্রকাশভঙ্গি : সুন্দর প্রকাশভঙ্গির দ্বারা মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। যার ভেতরটা যত বেশি সৌন্দর্যপূর্ণ, তার বাইরের প্রকাশভঙ্গি ততটাই আকর্ষণীয়। একজন সুন্দর প্রকাশভঙ্গির ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ বিশ্বটাকে একটি জাদুঘর বলে মনে করে, যেখানে সে প্রতিনিয়ত তার সুন্দর আচরণের প্রদর্শন করে থাকে।

উত্তম কাজ : উত্তম কাজ করার মাধ্যমে কারও হৃদয়ের সুন্দর ভাবনাগুলো প্রকাশ পায়। যারা উত্তম কাজে অভ্যস্ত, তারা পৃথিবীটাকে একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বলে মনে করে, যেখানে তারা নিজ নিজ উত্তম কাজের মাধ্যমে একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়।

পৃথিবীটাকে আলাদা আলাদাভাবে একটি পরিবার, একটি গবেষণাগার, একটি জাদুঘর কিংবা একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র মনে করা যেতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে এই চারটি জিনিসকে এক পৃথিবীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু নবিজির মধ্যে এই চারটি গুণই একই সাথে এবং সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে একজন আল্লাহর বান্দা, চিন্তাবিদ, বাগ্মী এবং কর্মবীর। কর্মের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সবকিছুর আগে তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন বান্দা। কারণ, তাঁর চিন্তা-ভাবনা, কথা ও কাজ—সবকিছুই আবর্তিত হতো আল্লাহর ইবাদতকে ঘিরে। আল্লাহর ইবাদতই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। আর আল্লাহর ইবাদত করার এই মনোভাব তিনি বংশগতভাবেই ধারণ করেছিলেন। কারণ, তিনি এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আবহমান কাল ধরে কাবা শরিফ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল সে বংশের কাঁধে। তা ছাড়া তাঁর পূর্বপুরুষদের সকলেই আল্লাহকে বিশ্বাস করত।

ইতিহাসের পাতায় নবিজি

নবিজির সাথে ইতিহাসের যোগ

নবিজি তাঁর নিজ সত্তায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন। মহত্ত্বের প্রতিটি মানদণ্ডে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। সকল সভ্যতার, সকল বয়সের, সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে তিনি মহত্ত্বের মাপকাঠিতে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুতরাং চলুন জেনে নেওয়া যাক, ইতিহাসে এই মহৎ মানুষটির অবস্থান কোথায়?

আরব উপত্যকায় ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে যদি এই ইয়াতিম শিশুটি জন্মগ্রহণ না করতেন, তবে পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে কোনো বিজয়ের ঘটনা ঘটত না। মধ্যযুগে ইউরোপীয় আন্দোলন হতো না; কোনো ক্রুসেড হতো না, হতো না কোনো বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। ইতিহাস ছিল একরকম, নবিজি জন্মগ্রহণ করার পর তা হয়ে গেল অন্যরকম। এই দুইয়ের মাঝখানেই জন্ম নিলেন এমন এক শিশু, যিনি এই পৃথিবীতে অন্যান্য শিশুদের মতোই কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলেন।

বিশ্বাসের বিজয়

ইসলাম মূলত ভূখণ্ড জয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেনি; বরং মানুষের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে সেখানে সন্নিবেশিত করেছে আলোর স্ফুরণ। ফলে দ্বীনের আলোয় আলোকিত মুমিনগণ অন্য সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। আর এভাবে মানুষকে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে সেখানকার ভূখণ্ড আপনাআপনিই চলে এসেছে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে।

এক ইউরোপীয় স্কলার একবার মুহাম্মাদ ﷺ, গৌতম বুদ্ধ ও যীশুখ্রিষ্টের মধ্যে তুলনা করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'মুহাম্মাদ ﷺ কি আসলেই কোনো নবি?' তাকে উত্তর দেওয়া হলো—'নিশ্চয়ই, তিনি একজন নবি এবং তাঁর মধ্যে নবিদের দুটি গুণই বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, তিনি তাঁর চারপাশে থাকা সকল মানুষের চেয়ে সত্যটা বেশি জানতেন। আর সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মহাসত্য জেনে নিয়ে তিনি তা প্রচার করতে চাইতেন সকলের মধ্যে।'

এই কাজ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথেই নবিজি আঞ্জাম দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের নবিদের চেয়েও অধিকতর সাহসী ও নির্ভীক। কারণ, সত্য প্রচার করতে গিয়ে তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, বছরের পর বছর অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন, নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন দূর পরবাসে, তবুও একবারের জন্য দমে যাননি। অবশেষে যখন তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি হিজরত করেছেন। হিজরত করে অন্য ভূখণ্ডে গিয়েও তিনি প্রচার করেছেন সেই একই অমোঘ সত্যের বাণী। শত্রুরা বিভিন্ন হুমকি-ধমকি ও লোভ দেখিয়েও তাঁকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে যত মহামানব তাঁদের আদর্শ প্রচার করেছেন, তাঁদের কেউ-ই নবিজির মতো চিরস্থায়ী ও সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি। আর এ সবকিছুই সম্ভব হয়েছে তাঁর মধ্যে থাকা সত্য প্রচারের তীব্র

আকাঙ্ক্ষার কারণে। অনেকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে—নবি মুহাম্মাদ ﷺ একত্ববাদের তত্ত্ব বুঝতে পেরে নিজের মধ্যে রেখে না দিয়ে সেটা প্রচার করতে গেলেন কেন? এর উত্তর হচ্ছে—সত্য প্রচার করার এক সহজাত ও অদম্য ইচ্ছাই এই কাজের দিকে ধাবিত করেছে তাঁকে।

মুসলিম-অমুসলিম যেকোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে, নবিজির বিজয় ছিল মূলত বিশ্বাসের বিজয়। নবিজির শক্তি ছিল মূলত ঈমানের শক্তি। নবিজির মিশনের জন্য এর চেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা আর হতে পারে না। একবার কুরাইশরা তাঁকে দমানোর সকল চেষ্টায় নিরাশ হয়ে অবশেষে তারা উতবা বিন রবিয়ার মাধ্যমে তাঁর নিকট একটি লোভনীয় প্রস্তাব পাঠায়। সে এসে নবিজিকে বলে—'তোমার উদ্দেশ্য যদি ধনসম্পদ অর্জন করা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তোমার জন্য এত ধনসম্পদ সংগ্রহ করে দেবো, যাতে তুমি আমাদের সবার চেয়ে ধনবান হয়ে যাবে। আর যদি নেতৃত্ব ও ক্ষমতা হাতে পেতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা ও সর্দার নিযুক্ত করতে রাজি আছি; এমনকী আমরা তোমাকে দেশের রাজা হিসেবে মেনে নিতেও প্রস্তুত। আর যদি তোমার ওপর কোনো জিনের প্রভাব হয়েছে বলে মনে করো, তাহলে আমরা তোমার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি।' সব প্রস্তাব শোনার পর নবিজি বললেন—'তোমার কি বলা শেষ হয়েছে? পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে—

> حٰمٓ - تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ - بَشِيْرًا
> وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ - وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ
> اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ -
>
> "হা-মিম। এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আররি কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ফলে তারা শুনতে পায় না। তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল।"' সূরা ফুসসিলাত : ১-৫

এভাবে নবিজি উতবার প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করে দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন, তাঁর দাওয়াতি মিশনের পেছনে পার্থিব কোনো ভোগ-বিলাসিতার উদ্দেশ্য ছিল না; এমনকী ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও তিনি রাষ্ট্রীয় কোনো সম্পত্তির দিকে হাত বাড়াননি। নবিজি মূলত তাঁর নবুয়তি মিশন সম্পন্ন করার মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ শান্তি পেতেন, তার তুলনায় দুনিয়ার সকল ভোগ-বিলাসিতা ছিল তাঁর কাছে অতি নগণ্য। আর এই স্বর্গীয় সুখানুভূতির জন্যই তিনি দুনিয়াবি সকল ভোগ-বিলাসিতার প্রস্তাব দুহাতে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, নবিদের সর্দার।